সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় মিত্রদের স্বার্থে তৈরি SEZ আইন ও অন্যান্য শোষণ নীতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ ভারতের সংগ্রামী বামশক্তির কর্তব্য

(MKP আয়োজিত SEZ বিরোধী সর্বভারতীয় কনভেনশনে ২ অক্টোবর ০৭-এর আলোচনার জন্য পেশ করা হল)

প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণী তথা মেহনতি জনতার ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবেই শোষকশ্রেণী কিছু নতুন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ঘোষণা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মেহনতি মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপস্থিতি, চীন-বিপ্লব, পূর্ব ইউরোপের বিহভিন্ন দেশে পুরোনো শোষণ কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাব বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের পাশাপাশি এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা মুক্তিসংগ্রামও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগকে কার্যতঃ নস্যাৎ করেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাব ঐ শতাব্দীর ৬০-এর দশক থেকে ক্রমাগত বেড়ে উঠতে থাকে। শোষণ ব্যবস্থার দিক থেকেও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র মালিকদের মুনাফার হার বৃদ্ধির লালসাকে সম্পূর্ণ অর্থে চরিতার্থ করতে পারছিল না। এই সংঘাতের এক অনিবার্য ফসল হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনাম আগ্রাসন ও তাদের পরাজয় এই টানাপোড়েনে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে শোষিত মানুষের এই জাগরণ স্পষ্ট বিপদ সূচিত করেছিল। গত শতাব্দীর ৭০-এর দশক পর্যন্ত এই সংগ্রামী বাতাবরণ জারি ছিল। কিন্তু নানান কারণেই শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনতার এই লড়াই পরবর্তীতে সারা বিশ্বে দুর্বল হতে থাকে। একদিকে মুনাফার হার বৃদ্ধির চিরন্তন লালসা অন্যদিকে মেহনতি মানুষের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আপাত পরাজয় আন্তর্জাতিকভাবে শোষকশ্রেণীকে পুনরায় আগ্রাসী করে তুলেছে। ৮০-র দশকে তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলির পতন, চীনের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পুঁজিবাদী পথে যাত্রা ইত্যাদি ঘটনাগুলি আগ্রাসনের মাত্রাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে দুনিয়া জুড়ে শোষণ ব্যবস্থা তথা মালিকদের আধিপত্য নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

এই সময় দুনিয়া জুড়েই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের অজুহাত খাড়া করে বহুজাতিক সংস্থাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা পূনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। কেন্দ্রীভূত উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা, স্থায়ী কাজের অবলুপ্তি ঘটিয়ে আউটসোর্সিং ও ব্যাপক পরিমাণ ঠিকা প্রথায় উৎপাদনের প্রচলন, সস্তা শ্রমিক ও কাঁচমাল এবং দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা সম্পন্ন দেশগুলিতে উৎপাদন কেন্দ্র পরিবর্তন, সমস্ত দেশের বাজার বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে উন্মুক্ত করে দেওয়া— এসবই কিছুই ঘটতে থাকে অত্যন্ত দ্রুততায়। এই গোটা প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয় বিশ্বায়ন।

ভারতও এই প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে থাকে গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকের শেষভাগ থেকে। GAAT-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, Level Playground-এর তত্ত্বের নামে এযাবতকাল চালু থাকা দেশজ শিল্প ও কৃষিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি বাতিল করা হয়। অবাধ পণ্য প্রবেশ, অবাধ বিনিয়োগের জন্য সমস্ত আইনী বাধা তুলে দেবার জন্য কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের (Structural Adjustment)-এর ব্যবস্থা করা হয়। উন্নত বিশ্বের চড়া মজুরি ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার দায় থেকে মুক্তি পেতে অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রম ও কাঁচমাল এবং দুর্বল সামাজিক নিরাপত্তা সম্পন্ন অঞ্চলে (যেমন ভারত) উৎপাদন কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমে গ্যাটচুক্তিতে সই করে ভারত সরকার এই নীতি রূপায়ণের পথ সুগম করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর নরসিমহা রাও-মনমোহনের সরকার তা নীতি আকারে গ্রহণ করে।

এই সময় থেকে ভারতে আমদানি শুল্কের হার কমতে কমতে বর্তমানে উৎপাদন শুল্কের সমস্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। তাই দেশীয় পণ্য ও বিদেশি পণ্যের মধ্যে ফারাক ঘুচে গেছে। শেয়ার বাজারকে খুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশি অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন ও পরিষেবার প্রায় পুরোক্ষেত্রটাই খুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশি লগ্নির সামনে।

আজ থেকে ১৬ বছর আগে ভারতের বুকে শোষকশ্রেণীর এই নয়া পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল। বিগত বছরগুলিতে যারাই দিল্লির মসনদে বসেছে, সে তৃতীয় ফ্রন্টের দেবেগৌড়া বা গুজরাল সরকার হোক, বিজেপি পরিচালিত NDA সরকারই হোক আর সাম্প্রতিকতম বাম সমর্থিত UPA সরকারই হোক, পরিবর্তনের চাকা সকলেই একই দিকে চালিয়েছে। নীতির পরিবর্তন তো হয়ই নি, উল্টে কোনো কোনো সময় এই শোষণ নীতি এত মারাত্মক হয়ে উঠেছে যে বিরোধী মালিকশ্রেণীর দলগুলিও প্রতিবাদ না করে পারেনি। যদিও ক্ষমতায় বসবার পরই এই শোষন নীতি রূপায়ণে তাদেরও ভোল বদলে গেছে নিমেষেই।

দেশি-বিদেশি মালিকদের শোষণচক্রের নবতম সংযোজন SEZ

বাজপেয়ী সরকারের আমলে যখন গোটা দেশের অর্থনীতিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবার জন্য দাপাদাপি সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠেছে, জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে সরকারি লাভজনক কারখানাগুলি, সেই ২০০০ সালেই তার সঙ্গে সংযোজিত হল দেশজুড়ে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব। বিজেপি মন্ত্রিসভাকে শক্তি জোগাল এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন সিপিআই(এম)। গত ২০০৩ সালে দেশের মধ্যে ব্যবসার জন্য 'বিদেশি ভূখণ্ড' গঠনের প্রস্তাব দিয়ে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল বিল, ২০০৩ (Special Economic Zone Bill, 2003) বানাল তারা। এ-ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না গুজরাটের বিজেপি পরিচালিত নরেন্দ্র মোদি সরকারও। বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল বাম-সমর্থিত ও কংগ্রেস পরিচালিত UPA সরকারের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। ২০০৫ সালের ৯ মে ও ১১ মে সংসদের উভয়কক্ষে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম সহ সমস্ত সংসদীয় দলের সাংসদদের সর্বসম্মত ভোটে তৈরি হল বিশেষ আর্থিক অঞ্চল আইন, ২০০৫ (SEZ Act, 2005)। গত দুবছরে ভারতে ৩৪১টি 'বিশেষ আর্থিক অঞ্চল' প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে গিয়েছে আরো প্রায় ২৫০টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায়। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী গোটা দেশে ১০০০টি SEZ গড়ে তোলা হবে। এই মুহূর্তে ভারতের বাইরে গোটা বিশ্বে মোট SEZ-এর সংখ্যা ৪০০-র আশেপাশে। যে চীনকে মডেল করে SEZ আইন ভারতে প্রণয়ন করা হয়েছে, তার সঙ্গে ভারতীয় SEZ-এর ফারাক আছে বহুক্ষেত্রেই। 'রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের' মিথ্যে যুক্তি সাজিয়ে দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র বানানোর উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে SEZ আইন। মুনাফার হার বৃদ্ধি নিশ্চিত করতেই গড়ে তোলা হচ্ছে এই ঔপনিবেশিক প্রকল্প।

বাস্তবত, SEZ ভারতীয় মানচিত্রের মধ্যে এমন এক বিদেশি অঞ্চল, যেখানে ভারতীয় আইন না মানাটাই সাধারণ আইন বলে বিবেচ্য হবে।

SEZ নির্মাতা ও উৎপাদক সংস্থাগুলি সমস্ত রকমের শুল্ক ও কর থেকে ছাড় পাবে। এর ফলে দেশের কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হানি ঘটবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-গণবন্টন ব্যবস্থা-দারিদ্র্য দূরীকরণ সহ নানান সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমতে থাকবে অথবা বাড়তে থাকবে মাথা পিছু বৈদেশিক ঋণের বোঝা।

SEZ নির্মাতা বিনা শুল্ক ও করে যথেচ্ছ মাত্রায় প্রোমোটিং ব্যবসা করতে পারবে। এই রিয়েল এস্টেট-এর ব্যবসায় সহজেই উচ্চমুনাফার লোভে ভিড় করবে ফাটকা পুঁজি। তাদের সমস্ত কদর্যতাকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

SEZ-এ শ্রম আইন মান্য করার বিষয়টি প্রায় নস্যাৎ করে দেওয়া হবে। SEZ হয়ে উঠবে দেশের মানচিত্রের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য 'বিশেষ শোষণ অঞ্চল'—দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের এক একটি নতুন উপনিবেশ।

SEZ স্থাপনের ফলে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবার কথা বলা হচ্ছে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবেন। শহুরে উচ্চশিক্ষিতদের একাংশের কিছু কর্মসংস্থান হলেও বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ জনগন তাদের কাজ হারাতে চলেছেন। মারাত্মাকভাবে বিপন্ন হবে গ্রামীণ পরিবেশও।

SEZ স্থাপনের ফলে যে পরিমাণ কৃষিজমি কমে যাবে, তাতে সৃষ্টি হবে খাদ্যসংকট। চুক্তিচাষকে আইনসঙ্গত করে তোলার মধ্যে দিয়ে কৃষি উৎপাদনে বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়ে উঠবে। বাড়বে কৃষকদের আত্মহত্যা, কৃষিশ্রমিকদের বেকারিত্ব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে, IMF ও বিশ্বব্যাঙ্কের পরিকল্পনায় ও বিশ্ববাণিজ্যসংস্থার পরিচালনায় ভারতকে দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র বানানোর যে উদ্যোগ SEZ আইন প্রণয়ন ও প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা এদেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ধারাবাহিক বিকাশেরই এক চরম পরিণতি। এই পরিণতি এদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের জীবনে নামিয়ে আনতে চলেছে এক ভয়াবহ সঙ্কট। শোষকশ্রেণী তথা দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের মুনাফার স্বার্থকে বজায় রাখতেই এই চরম সঙ্কট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের কোটি কোটি মেহনতি জনতার ওপর।

SEZ গঠনের মাধ্যমে শোষণের যে বাধাহীন অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে, তা দেশ-বিদেশের মালিকদের সকলকেই যে শেষ পর্যন্ত SEZ-এর অন্তর্ভুক্ত হতে প্রলুব্ধ করবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ জমি-ভিটে থেকে কৃষক-ক্ষেতমজুরকে উচ্ছেদ করে যে SEZ স্থাপন হচ্ছে, তা আগামীতে উচ্ছেদের তরবারি শানাবে শ্রমিকদের বুকে। দেশের ৪০ কোটি শ্রমিক-কর্মচারীর অর্জিত অধিকার তথা বর্তমান অস্তিত্বকেই আমূল বদলে দিতে চাইবে শোষকশ্রেণী।

SEZ ও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী

এদেশে এই মুহূর্তে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। এদের মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন সংগঠিত ক্ষেত্রে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত বাকি ৩৭ কোটি শ্রমিকের মধ্যে ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ কাজ করেন কৃষিক্ষেত্রে। নির্মাণ শিল্পে আছেন ১ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ। আরো প্রায় ১২ কোটি শ্রমিক কাজ করেন খনি, ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিষেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ৯৩ শতাংশ কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ১৬ বছর আগে এদেশে উদারিকরণ-বেসরকারীকরণের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংগঠিত শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে। কমেছে স্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা। একদিকে উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে ঠিকা প্রথার ব্যাপক প্রয়োগ, অন্যদিকে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনকে ক্রমাগত ভেঙে দিয়ে আউটসোর্সিং ও সাব কন্ট্রাক্টিং মারফৎ দেশের শ্রমজীবী জনতার সিংহভাগকে চরম অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। কি কৃষিক্ষেত্র, কি অকৃষিক্ষেত্র—উভয়ক্ষেত্রে গত ২৭ বছরে দেশের প্রকৃত উৎপাদকদের ব্যাপক অংশের ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন

পর্যন্ত প্রণয়ন করা যায়নি। ১৯৭০ সালে তৈরি করা ঠিকা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ আইন তুলে দেবার জন্য শাসকগোষ্ঠী দলমত নির্বিশেষে তৎপর। NDA আমলের কৃষি-শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা 'কৃষি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' বা UPA সরকারের 'আম আদমি বীমা যোজনা'র মধ্যে প্রথমটা শুরু হয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে 'অর্থের' অভাবে আর দ্বিতীয়টি 'শুভারম্ভে'র মুখ দেখতেই পারেনি রাজ্য সরকারগুলির 'অসহযোগিতা'য়। UPA সরকার গঠনের সময় 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি'তে বলা হোক, 'সরকার কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আইনের পূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে' অথবা 'সমস্ত শ্রমিকদের জন্য, বিশেষ অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য, যারা গোটা দেশের সমগ্র শ্রমিকশক্তির ৯৩ শতাংশ, কল্যাণমূলক ভূমিকা পালনে দৃঢ়ভাবে দায়বদ্ধ' ইত্যাদি কথা বলা যতই হোক না কেন শোষকশ্রেণী যে এসব কিছুই করবে না, SEZ আইন প্রনয়ন ও রূপায়ণের মাধ্যমে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, এই একই সময় অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রস্তাব, যা গত ২৭ বছর ধরে শুধুই চালাচালি হচ্ছে, তাকে বিশ বাঁও জলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

SEZ নামক উপনিবেশগুলি চালানোর জন্য অত্যন্ত সস্তায় শ্রমিক পাওয়া এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ব্যয় যে অত্যন্ত স্বল্প হওয়া জরুরি, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যে আমাদের দেশের অসংগঠিত শ্রমিককূলেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। SEZ-এর 'রপ্তানিজনিত' মুনাফার স্বার্থে তাদের ইজ্জত অধিকার আত্মমর্যাদার বিনিময়ে 'ঔপনিবেশিক শ্রমিক' তথা দাসে রূপান্তরিত হতে হবে। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবেন শ্রমিকশ্রেণী তথা মেহনতি জনগণ—দেশের ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ।

ভারতে দারিদ্র্যের প্রকৃত চিত্র ও SEZ

ভারতে দারিদ্র্য পরিস্থিতি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দারিদ্র্য মাপার বহু সূচকের ব্যবহার থাকলেও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি হল, কাজ করার উপযোগী স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্তরের ক্যালরি গ্রহণের সক্ষমতা। একজন শ্রমজীবি মানুষের দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ দিয়ে তা ঠিক করা হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMF)-এর স্বীকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী একজন শ্রমজীবী মানুষের শহরের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দৈনিক ২১০০ ক্যালরি ও গ্রামের ক্ষেত্রে দৈনিক ২৪০০ ক্যালরি খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন। উল্লেখিত সূচক অনুযায়ী একজন শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরি এই প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে। যদি কোনো শ্রমজীবীর এই ন্যূনতম চাহিদা তার রোজগার দিয়ে পূরণ না হয়, তবে তাকে দরিদ্র বলে ধরা হবে। দারিদ্র্য মাপার এই প্রত্যক্ষ মানদণ্ডটি ছাড়াও আরো কিছু অপ্রত্যক্ষ মানদণ্ড-ও অর্থনীতি বিজ্ঞানে আছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ঐ অপ্রত্যক্ষ সূচকের কোনো কোনোটি ব্যবহার করে গ্রামীণ দারিদ্র্য সম্পর্কে এক চরম মিথ্যাচার চালাচ্ছে। তাদের মতে ২০০৪-০৫ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্যের পরিমাণ জনসংখ্যা ২৮.৫ শতাংশ। বিপরীতে ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা উপরে উল্লিখিত সূচকটি ধরে আলোচনা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন। ১৯৯০ সালে মাথাপিছু খাদ্য জোগান বাৎসরিক ১৭৭ কেজি থেকে কমতে কমতে ২০০৩-০৪ সালে ১৫৩ কেজিতে এসে নেমেছে, যা ১৯৩৭-৪১ সালের গড় মান ১৫৭ কেজি-রও কম। বর্তমানে ভারতীয় গ্রামীণ পরিবারগুলি বছরে পরিবার পিছু ১১৫ কেজির কম খাদ্য পায়। গড় ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত নিম্নগামী। SEZ গঠনের সামগ্রিক চিত্রটি গোটা দেশের মেহনতির মানুষের জীবনে নিঃস্বতর হবার যে আঘাত নামিয়ে আনছে তা দাস ব্যবস্থার সময়কার দারিদ্র্যের ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রামীণ দারিদ্র্যের ভয়াবহতা আরো প্রকটই হয়ে উঠেছে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে। বিগত ৪০ বছরে এই প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। SEZ আইন যেভাবে কৃষিপণ্যের বহুজাতিকদের কাছে কেবল সস্তায় শুল্ক ও করহীন উৎপাদন-ই নয়, এমনকি চুক্তিচাষের সুযোগ এনে দিয়েছে, গোটা দেশের কৃষিজমিতে। তাতে এদেশের কৃষি ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ আরো তীব্র হয়ে উঠবে।

SEZ : কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নয়া দলিল

গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে 'সবুজ বিপ্লবে'র নাম করে সাম্রাজ্যবাদীরা কৃষিক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। বিদেশ থেকে কিছু উচ্চফলনশীল বীজ এদেশে আনা হয়। এই সব বীজ চাষের জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল, রাসায়নিক সার-কীটনাশক ইত্যাদি। বস্তুত আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের আগে থেকেই এই নতুন প্রযুক্তির কৃষি এদেশে ভাল পরিমাণেই চালু হয়ে যায়। আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি চালু হওয়ার পর আরো কিছু নতুন বিষয় এর সাথে যুক্ত হয়। ভারতীয় নানারকম ফসল ও উদ্ভিদের পেটেন্ট বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া, GM ভ্যারাইটির বীজ এদেশে আমদানি করা, রপ্তানিমুখী চাষবাস শুরু করা, কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশ, চুক্তিচাষ—এসবই আসে সংস্কার তথা বিশ্বায়নের হাত ধরে। বীজ থেকে শুরু করে কৃষিঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের ৭০-৮০ শতাংশ চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

পরিকল্পিত খাদ্যসঙ্কট তৈরি করা হচ্ছে; কৃষিতে বেশি রোজগারের স্বপ্ন দেখিয়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমিয়ে রপ্তানিমুখী উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য পুঁজিপতিদের নানারকম ছাড় দেওয়া হচ্ছে, অথচ কৃষিকে ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে লাগাতারভাবে। FCI-কে পরিকল্পিতভাবে অকেজো করে দেওয়া হচ্ছে। ২০০৬ সালে সরকারি স্তরে সাড়ে ৫ মিলিয়ন টন গম আমদানি করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ৫০০০ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও বেসরকারি স্তরে আরো ৭৫ লক্ষ টন গম আমদানি করা হয়েছে। 'সবুজ বিপ্লব'-এর দেশ ভারত এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় গম আমদানিকারী দেশ।

উভয় SEZ আইন মোতাবেক, কৃষিপণ্য উৎপাদকরা, SEZ-এর অভ্যন্তরেও ভারতীয় শুল্ক অঞ্চলেও উভয় জায়গাতেই চুক্তি-চাষ করাতে পারবেন। এই চুক্তি চাষে বীজ-আর রাসায়নিক SEZ ভুক্ত সংস্থার থেকে নেওয়া বাধ্যতামূলক। দাদন নেওয়া থেকে ফসল বিক্রি পর্যন্ত SEZ আইন মোতাবেক, আমাদের দেশিয় উৎপাদক অর্থাৎ কৃষক কৃষিপণ্য প্রস্তুতকারক বহুজাতিকের দাস। একদিকে প্রধান খাদ্যশস্য 'অলাভজনক' বলে উৎপাদন করা বন্ধ করে দেবে বহুজাতিকগুলি, অন্যদিকে রপ্তানির লক্ষ্যে অর্থকরী ফসল-এর চাষের মৃত্যুচক্রে ঢুকে পড়বে কৃষককুল যাদের কাছে ঠিকমতো উৎপাদন না করতে পারলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। ব্রিটিশ যুগে নীল চাষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকেও হার মানাতে চলেছে SEZ-এর চুক্তি চাষ। সাথে সাথে সৃষ্টি হওয়া তীব্র খাদ্যসঙ্কট মোটাতে 'রপ্তানি থেকে আসা ডলার' ব্যয়িত হবে খাদ্য আমদানিতে। শিল্প ও কৃষি—উভয়কেই উপনিবেশীকরণের এমন সুদৃঢ় আইনে একসাথে বেঁধে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী কৌশল সত্যিই বিরল।

সেজ : দেশি-বিদেশি মালিকদের স্বার্থে পরিচালিত একটি 'উন্নয়ন' যজ্ঞ

বিশ্বায়নের একটি জনপ্রিয় স্লোগান 'উন্নয়ন'। বড় বড় রাস্তা, উড়ালপুল, ঝাঁ-চকচকে শপিংমল, বহুতল বাড়ি—চারিদিকে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে এটাই উন্নয়ন। 'উন্নয়নে'র নামে হকার উচ্ছেদ, বস্তি উচ্ছেদ, বহু ফসলি কৃষিজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, বনাঞ্চল থেকে আদিবাসী মানুষের উচ্ছেদ—এসব কিছুই চলছে। জল-জঙ্গল-জমির অধিকার হারাচ্ছেন মানুষ, বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন মানুষ। মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া—এটাই সরকার নামক প্রোমোটার-এর কাজ। প্রোমোটারদের নাম দেওয়া হয়েছে উন্নয়নকারী (Developer)।

জমি হারানো কৃষক, উচ্ছেধ হওয়া হকার বা বন্ধ কারখানার শ্রমিক বা এই রকম লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষ পরিণত হচ্ছেন, দোকানের সেলস্‌পারসন, কিংবা সিকিউরিটি গার্ড কিংবা উচ্চবিত্ত বাড়ির কাজের লোক অথবা একদম বেকারে। SEZ হওয়ার কারণে গোটা দেশে কাজ হারাবেন বা উচ্ছেদ হবেন ১০ লক্ষ মানুষ। এই উন্নয়ন-এর ঠেলায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষদের অনাহার দারিদ্র্যকে প্রশমিত করার জন্য অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনা, মিড-ডে-মিল, স্বনিযুক্তি প্রকল্প, বিপিএল কার্ড গ্রামীন কর্মনিযুক্তি প্রকল্প ইত্যাদি নানান তাপ্পি দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। এমনকি শিক্ষকতা-সরকারি চাকুরিতেও ঠিকাপ্রথায় কম বেতনে নিয়োগ করা হচ্ছে। এইভাবে জীবন-জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে আলোচনা করলে দেখা যাবে বিশ্বায়নের হাত ধরে যে সংস্কার এদেশে শুরু হয়েছে তার মূল কথা দেশি-বিদেশি শোষকশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো।

এসবেরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে SEZ আইন ও তার রূপায়ণ প্রক্রিয়া এসেছে। সেজ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নবতম প্রকল্প। এর বিরুদ্ধে, প্রতিরোধের সংগ্রাম গড়ে তোলা তাই সংগ্রামী বামপন্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

'সেজ' বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামী বামশক্তির কর্তব্য

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শোষকশ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধি আগ্রাসন যে নতুন রূপগুলি এসে উপস্থিত হচ্ছে, তাকে প্রতিরোধ করা এবং সমাজকে শোষণমুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব আজ আবারো নতুন করে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের দেশেও দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের নয়া শোষণব্যবস্থার রূপ হিসাবে যেভাবে SEZ আইন প্রণয়ন ও ব্যাপক পরিমাণ SEZ প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে তাকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। এই শোষকশ্রেণী SEZ গঠনের মাধ্যমে যেভাবে এদেশের ন্যূনতম সার্বভৌমত্বটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে, গড়ে তুলতে চাইছে দেশি-বিদেশি মালিকদের নয়া উপনিবেশে—তা, এককথায় সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কৌশল। সাম্প্রতিক ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি ও এই আগ্রাসনের অপর হাতিয়ার। সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের ওপর বড় ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা নিয়ন্ত্রিত পথে আমাদের দেশকে নিয়ে যাওয়া চেষ্টা চলছে। সারের দিক থেকে আমাদের লড়াইও তাই দেশিয় শাসকবর্গের নীতির বিরোধিতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শোষণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে।

দেশি-বিদেশি বৃহৎ মালিকদের এই নয়া শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম কিভাবে এবং কাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠতে পারে? সাম্প্রতিককালে ভারতে SEZ-এর বিরুদ্ধে বা কৃষকের জমি রক্ষার দাবিতে যে আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে, তাতে এমনকি শাসকদলগুলির আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত দলগুলিই (কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়স্তরেই) নীতিগতভাবে SEZ-এর সমর্থক। এই ব্যাপারটা অনেকটা এরকমও যে, অনেকেই ক্ষমতায় থাকলে এই নীতি রূপায়ণ করছে। ক্ষমতায় না থাকলে আন্দোলন থেকে সুবিধা নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই গোটা আন্দোলনের সিংহভাগ আবর্তিত হচ্ছে জমি দেওয়া না দেওয়া নিয়ে বা জমির দাম বাড়ানোর বা ক্ষতিপূরণের দর কষাকষিতে। সচেতনভাবে SEZ নীতিকে ব্যাখ্যা করে জনমানসে বোঝানো, এই নীতি বাতিলের দাবিতে সচেতন সংগ্রাম গড়ে তোলা, SEZ প্রকল্পগুলি স্থগিত করানোর জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা—এই সচেতন কর্তব্যগুলি পালনে বর্তমান লড়াইগুলি বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে বলা চলে।

আমাদের স্পষ্টভাবেই বোঝা প্রয়োজন যে, এই দুর্বলতা নিয়ে শাসকদের এই নয়া শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন বেশিদূর এগোতে পারবে না। দেশের লক্ষ-কোটি মেহনতি জনগণের সামনে এই নয়া শোষণের স্বরূপ ও তার কুফল সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে না

পারলে প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিত্তিই রচনা করা যাবে না।

এই কাজ যে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি করবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখেছি, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এদেরে কেউ কেউ কোথাও কোথাও জমি রক্ষার আন্দোলনে যোগ দিলেও, শেষতঃ প্রায় সকলেই SEZ নীতির পক্ষে। লালঝাণ্ডাধারী সরকারি বামপন্থীরাও এখন যোগ দিয়েছেন মালিকশ্রেণীর শিবিরে। সংসদে SEZ আইন পাশ হবার সময় এদের ৬১ জন সাংসদই ভোট দিয়েছেন SEZ আইনের সপক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রামে SEZ গঠন করতে গিয়ে CPI(M) পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনী দিয়ে গণহত্যা সংগঠিত করলে CPI—RSP-FB-এর বিরোধিতা অবশ্য নজরে আসে। এর পরবর্তীতে RSP ও FB এই আইন বাতিলের দাবি করেছে। অন্যদিকে CPI(M)-এর মত CPI-ও এই আইনের কিছু কিছু সংশোধনের পক্ষে বলছেন। কিন্তু এরাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতার আকর্ষণ ও সাধারণভাবে আত্মসমর্পণবাদী রাজনীতির চক্রে আটকে থাকার কারণে এই সরকারি বামপন্থীদের পক্ষে এই আন্দোলনে সচেতন নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

অথচ এই সচেতন সংগ্রামকে প্রকৃত মর্মবস্তু সহ উপস্থিত করতে পারেন একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থীরাই। কেবলমাত্র তাদের সচেতন নেতৃত্বেই জমিরক্ষার আন্দোলনের পাশাপাশি বিকশিত হতে পারে প্রকৃত সেজ-বিরোধী আন্দোলন। যা মর্মবস্তুর দিক থেকে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামও বটে। পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার লড়াই সংগ্রামী বামশক্তির ঘোষিত লক্ষ্য। সেই দূরায়ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এদেশের সংগ্রামী বামপন্থীদের সামনে সেজ-বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়েছে।

সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন সংগ্রামী বামশক্তির মধ্যেকার সংগঠনগুলি প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত তীব্রভাবে SEZ আইন প্রণয়ন ও SEZ প্রকল্প রূপায়ণের বিরোধিতা করছেন এবং নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ভূমিকা পালন করছেন। দেশে বিভিন্ন প্রান্তে সেজ-বিরোধী আন্দোলনে এই সংগ্রামী বামশক্তি নানাভাবে উপস্থিত আমাদের মনে রাখতে হবে গোটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এককভাবে সংগ্রামী বামশক্তির সংগঠনগুলি প্রত্যেকেই কম-বেশি দুর্বল। আবার যে লড়াই আমরা সচেতনভাবে গড়ে তুলতে চাইছি, সর্বপ্রথম তা বহন করতে পারে এই সংগ্রামী বামশক্তিই। তারাই পাবেন সমগ্র আন্দোলনে এক সচেতন দিশা দান করতে। নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে সংগ্রামের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন তারাই।

সংগ্রামী বামশক্তির পক্ষে একটি সঠিক দিশায় এই কার্যকরী নেতৃত্ব দেশজুড়ে সৃষ্টি করতে এই মুহূর্তে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আমাদের মীমাংসা করা প্রয়োজন। যেমন, বর্তমান সেজ আইন ও প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আন্দোলন কি শুধুমাত্র সংগ্রামী বামশক্তি করবে? বিভিন্ন সেজ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে গণকমিটি তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে সংগ্রামী বামশক্তির কি সম্পর্ক হবে? সংগ্রামী বামশক্তির আভ্যন্তরীণ ঐক্য কি কি শর্তের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে? কতদূর পর্যন্ত তা ঐক্যবদ্ধ হস্তক্ষেপ করবে আর কোথায়ই সংগ্রামী বামশক্তির অন্তর্ভূক্ত সংগঠনগুলির স্বাধীন উদ্যোগ জারি থাকবে?

এই প্রশ্নগুলি বাস্তব মীমাংসার ওপর দাঁড়িয়ে যদি কংগ্রেস, বিজেপি বা সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন সরকারি বামেদের বিপরীতে এক সংগ্রামী বামশক্তির আত্মপ্রকাশ আমরা সুনিশ্চিত করে তুলতে পারি। তাহলেই দেশব্যাপী সেজ বিরোধী সংগ্রামকে এক সচেতন দিশায় পরিচালিত করার সম্ভাবনা বেড়ে উঠবে। মজদুর ক্রান্তি পরিষদ এই দিশায় এগোবার লক্ষ্যে আন্তরিক ও অবিচল থাকতে চায়। কমরেডস্, সময়ের চাহিদাকে ন্যায্যভাবে পূরণের লক্ষ্যে, আসুন, আমরা সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করি ও নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হই।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

১ অক্টোবর, ২০০৭

কেন্দ্রীয় কমিটি

মজদুর ক্রান্তি পরিষদ